আর্টফাইন, ভল্যুম-০৬, জুন-২০২০, পৃ. ১৯ - ৩৩

নকশি শিকা ও গ্রাম বাংলার পল্লী নারীর শিল্পসত্তার একটি পর্যালোচনা

ফারহানা তাবাস্‌সুম*

সার-সংক্ষেপ: [বাংলার কারুশিল্পের রয়েছে সুদীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাস। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শিকা শিল্প। আমাদের বাংলার অতীত ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয় এই শিকা শিল্প। এ শিকা শিল্প তৈরি করেন মূলত নারীরা। বহু উপকরণে, রূপে, বৈচিত্র্যে, কারুকার্যে, এই শিকা শিল্পের মধ্যে বাঙালি ললনার শিল্পবোধ ও নান্দনিকতার বহি:প্রকাশ ঘটে। কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের গৃহস্থ বাড়ির মেয়েরা ফসল বপন শেষে প্রচুর অবসর পায়। সে অবসর যাপনের এ সময়টিতে প্রয়োজনের নিরিখেই আরও অন্যান্য কিছু মেয়েলি শিল্পকর্মের মতো তারা তৈরি করে নকশি শিকা। এ সময়টি নারীদের বিনোদনেরও অংশ। এগুলো বাদ দিয়ে তাদের যাপিত জীবন পানসে। এ শিকা তৈরির সময় তাই নারীরা তাদের কারুশৈলীর গুণাবলী জাহির করে। নানা কৌশলে, নানা প্রয়োজনে তৈরি করে বৈচিত্র্যময় নকশি শিকা যা আমাদের বাংলার কারুশিল্পের ভাণ্ডারকে সুউজ্জ্বল করে এবং বিশ্ববাসীর কাছে এর গৌরব গাঁথা প্রকাশ করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। নকশি শিকা আধুনিকতার যাতাকলে পিষ্ট হয়ে মৃত প্রায় এ নকশি শিকা নিয়ে গবেষণার পাশাপাশি এর সংগ্রহ, তথ্য সংগ্রহ, নমুনা সংগ্রহের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।]

মানুষ প্রকৃতির পূজারী। প্রকৃতি থেকেই শেখে। প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ মানুষের সৌন্দর্যবোধকে পরিতৃপ্ত করে। সৌন্দর্য পিয়াসী মানুষের স্বভাবজাত নেশা সৃষ্টি করা, সৌন্দর্য অবলোকন করা ও নিজের মতো করে পেতে চাওয়া। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য জিনিসটি অলংকৃত করার কোন প্রয়োজন মানুষের হয়না। কিন্তু তারপরও মানুষ মনের আনন্দ আর ব্যবহারের প্রয়োজনকে এক করে সৃষ্টি করে কারুশিল্প। অর্থাৎ প্রয়োজন থেকে সৃষ্ট শিল্প যা নান্দনিক বোধের উন্মেষ ঘটায়। বাঙালী জীবনের প্রতিটি দিনের সঙ্গে ওতপ্রতভাবে জড়িয়ে আছে কারুশিল্প। তাই দেখা যায় যে, প্রতিদিনের ব্যবহার্য

---

* **ফারহানা তাবাসসুম:** সহকারী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

বস্তুটি যা কিনা এমনিতেই প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম তাতে শিল্প শৈলী প্রয়োগ করা বাঙালীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে। লোক ও কারুশিল্পের অন্যতম উপাদান শিকা গ্রামীণ দৈনন্দিন জীবনের অন্যতম অংশ। অত্যন্ত সহজ ও সরল আমাদের গ্রাম বাংলার লোকজ সমাজের যাপিত জীবন। নকশি শিকা এই সাদামাটা জীবনে বৈচিত্র্য প্রদানে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছে। পল্লী নারীর হাতে তৈরী একেকটি নকশি শিকার মধ্যদিয়ে তাদের লোকজ জীবনের নান্দনিক রুচিবোধ প্রস্ফুটিত হয়। সেই সাথে অন্দর সজ্জার অন্যতম উপাদান হিসেবে পরিগণিত হয় এই নকশি শিকা।

অলংকৃত শিকা, নকশি শিকা গ্রাম বাংলার লোকায়ত জীবনের অন্যতম অঙ্গ। এটি একান্তই বাংলার গ্রামীন মেয়েদের নিজস্ব শিল্প। গ্রামের মহিলারা তাদের কাজের ফাঁকে নানান অবসরে দৈনন্দিন জীবনের নিত্য ব্যবহার্য এই অতি প্রয়োজনীয় বস্তুটিকে তৈরী করেন সম্পূর্ন নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা ও নান্দনিকতার সমন্বয়ে। নকশি শিকার ব্যবহারিক গুরুত্বর পাশাপাশি নান্দনিক গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রাম বাংলার নারীদের হাতে তৈরী এই শিল্পকর্মে জড়িয়ে থাকে পরম মমতা আর যত্ন- এ যে তার সংসারের খাদ্যশষ্য ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য সবচাইতে উপযুক্ত, তাই এর কদরও ভিন্ন। মনে করা হয় যে সংস্কৃত 'শিক্য' থেকে বাংলা 'শিকা' শব্দটির উৎপত্তি। শিকা, শিকে বা ছিকে দ্রব্যাদি রাখবার জন্য দড়ি বা তারে তৈরি ঝুলন্ত আধার বিশেষ। বাঙালি রমণী আহার সামগ্রীকে নিরাপদে রাখার যে পন্থা অবলম্বন করেছে তার আর কোন বিকল্পই ছিলনা তাদের। মূলত পশুপাখিদের আক্রমন থেকে মুক্ত রাখার জন্য ঘরের কোণে ঝুলিয়ে রাখা হয় এই শিকাগুলো।

শিকা মূলত পাট বা পাট দিয়ে তৈরি রশি বা সুতো দিয়ে চুলের বেণির মতো করে বুনিয়ে বানানো এক ধরনের আধার। যাতে বয়ম, ছোটো হাঁড়িকুড়ি ভর্তি খাদ্য বা জিনিসপত্র ঝুলিয়ে রাখা হয়। যেসব জিনিস প্রতিদিন ক্ষণে ক্ষণে ব্যবহৃত হয় না, তা সব শিকেয় তুলে রাখা হয়। শিকে সবসময়ই ঝুলিয়ে রাখার ঝোলা ধরনের সাহায়কী। যা কিছু হাতের নাগালের বাইরে নিরাপদে রাখার দরকার হয়, গৃহপালিত অনিষ্টকারী পশু-পাখিদের নাগালের বাইরে রাখার দরকার হয়, দুরন্ত ছেলে-মেয়েদের নাগালের বাইরে রাখার দরকার হয়, তা-কিছুকে পাত্রে রেখে সেই পাত্র ছিকেয় তুলে সংরক্ষণ করা হয়। এর নিচের দিকে প্রসারিত থলের মতো। ওপরে ক্রমাগত বিনুনির পাশগুলো কমে এক বিন্দুতে মিলিত (অনেকটা খেয়াজালের মতো)। ওপরে লম্বা দড়ি থাকে, তার সাহায্যে ঘরের আড়ায় সুবিধামতো স্থানে ছিকে ঝোলানো হয়। 'বিড়ালের ভাগ্যে ছিকে ছেঁড়ো না' বাগধারাটির মাধ্যমে বোঝা যায় ছিকেয় রাখা পাত্রে এমন ধরনের খাদ্য সংরক্ষিত থাকে যে, তা ছিড়ে নিচে পড়লে বিড়াল সেটা খেতে পারবে বলে ঘটনাটি তার জন্য হবে সৌভাগ্যের। 'ও সব এখন ছিকেয় তুলে রাখো' বাঙালির এই নদীপাড়ের বিলুপ্তপ্রায় লোক ও কারুশিল্প প্রবচনটিও বুঝিয়ে দেয় যে, যা এখনই

ব্যবহার যোগ্য নয়, বা যা ভবিষ্যতে কাজে আসতে পারে তা ছিকেয় তুলে রাখার রেওয়াজ ছিল। [কবির:২০১৭:৪৬০]

শিকার ব্যবহার এখন পাল্টে গেছে। তবে আধুনিক রুচিতে তা আজ ঘরের শোভাবর্ধক শো-পিচের কদর লাভ করেছে। বিভিন্ন প্রবাদ প্রবচন ছাড়াও লোক গীতি, ছড়া, কাব্যে শিকার উল্লেখ মেলে যেমন - বাপে আইস্যা ঢাইল্যা দিল দুধ/ ওরে আনন্দের বাণী/ছিকার উপর তুলে রাখ দুধ/ওরে আনন্দের বাণী । -বিয়ের গীত, রাজশাহী, (ছিকার উপর গোশতের বাটি/গোশত খাইতে তুমি আইসো না । -বিয়ের গীত, চাঁপাইনবাবগঞ্জ), (দই কিন্যার গেনু রে মা মুই ঔমারীর হাটতে,/ছিকিয়্যা ছিড়ি দই পইল বাউঙ্কা আইল ঘাড়ত। -বিয়ে গীত, গাইবান্ধা), (আলুফা জিনিস যত কেউ না খাইয়া/ছোটো বইনের লাইগ্যা রাখছে ছিকায় তুলিয়া। -মৈমনসিংহ গীতিকা), (খয়া খয়া মাছের ঝোল/আর যাব না ছিকেয় তোল/ছিকে গেল ছিঁড়ে/মাছ ধড়ফড় করে । -লোকছড়া, কুষ্টিয়া)। (কবির : ২০১৭: ৪৬১)।

শিকা'র উদ্ভব কবে হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট ও সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এ শিল্পের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। এ ধারণা করা হয় যে মানব সভ্যতার আদি যাত্রা পর্বেই এর উদ্ভব হয়েছিল। কারণ অরণ্যচারী মানব তাদের সারাদিনের আহরিত খাদ্যবস্তু ব্যবহারের পর উদ্বৃত অংশ সংরক্ষণের জন্যে হয়তো লতা-পাতায় বেঁধে কোন বৃক্ষের শাখায় ঝুলিয়ে রাখতেন। এ থেকে একদিকে সংরক্ষিত খাদ্যাংশ জন্তু জানোয়ার, বন্য পাখি ও কীট পতঙ্গের হাত থেকে রেহাই পেতো, তেমনি অপর দিকে বাইরের মানব মানবীও তা সহজে গ্রহণ করতে সমর্থ হতো না। এমনি করেই বন্য লতা-পাতা দিয়ে আদিম মানবের মধ্যে বিভিন্ন খাদ্য ও ব্যবহার্য্য সামগ্রী সংরক্ষণের ঝুলানো পদ্ধতি থেকেই মানব সভ্যতার প্রথম স্তরেই হয়তো শিকা জাতীয় সামগ্রীর উদ্ভব হয়েছিল পরবর্তী পর্যায়ে মানুষের ক্রম বিবর্তন ও বিকাশে এ শিকাই পর্যায়ক্রমে উন্নত শিকায় বিকশিত হয়েছে বলে আমরা একটি প্রাথমিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি। (সাইদুর:১৯৯৯:৮)

সামান্য ব্যবহার্য দৈনন্দিন জীবনের এ বস্তুটি বাঙালি রমণীর হাতের ছোয়ায় হয়ে ওঠে অনন্য। কৌশলগত দিক, আঙ্গিকে ও বিভিন্ন উপকরণের সমন্বয়ে পল্লী রমণীরা শিকাকে নান্দনিক রূপ সম্ভারে পূর্ণ করে তোলে। বিভিন্ন ধরনের বিনুনি গাঁথা, গিট, ফাঁস তোলার মধ্য দিয়ে শিকায় নকশার সৃষ্টি করা হয় তাই একে নকশি শিকা বলা হয়। এর সাথে আনুষাঙ্গিক নানান জিনিসের ব্যবহার নকশি শিকাকে দৃষ্টিনন্দন করে তোলে। সাধারণ নিরাভরণ ছিকে ছাড়াও বাঙালি জীবনে শৌখিন বা নকশি ছিকের কদর এবং ব্যবহার ছিল। যেমন রংবেরঙের পাট, সাজ, সুতো ও পাট ইত্যাদি ফাঁস গিঁটের বুনন বা সরল গেঁরো দিয়ে ছিকে বানানো হতো। সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এর সাথে রঙিন পুথির বল, মার্বেল, কড়ি, ঝিনুক, এইসব ঝুলিয়ে অনেকটা ঝাড়বাতিসদৃশ ছিকে তৈরি করা হতো। ছিকের কি রাখা হবে, তার ওপর নির্ভর করতো সেটা কত বড়ো

লম্বা-চওড়া ও মোটা-চিকন দড়ির হবে। যেমন তলায় গিঁরা ছিকা, টুঙ্গি লহরিছিকা, গাইঞ্জাছিকা, আইনা ছিকা, জোড়াছিকা ইত্যাদি। এর কোনোটিতে পাত্র, কোনোটিতে জামাকাপড়, কোনোটিতে কাঁথা বালিশ ইত্যাদি রাখা হতো। সে আমলে রঙিন সুতা যোগাড় করা গেরস্তনারীদের পক্ষে অসুবিধাজনক ছিল। তাই তারা পরিত্যক্ত শাড়ির পাড় হতে নানা রঙের সুতা সংগ্রহ করতেন ।

শিকা তৈরীর প্রধান উপকরণ হচ্ছে পাট, এছাড়াও সুতা, শণ, নারকেলের দড়ি , খড় বা ঘাসের দড়ি প্রভৃতি দিয়েও বিভিন্ন প্রকার শিকা তৈরি করে এদেশের গ্রামে গঞ্জের মেয়েরা। শিকা তৈরি পদ্ধতি মূলত দু প্রকারের, একটি পাটকে পাক দিয়ে অপরটি বিনুনি কেটে (কাইয়ুম :২০১৩:২১)। আবার পাটের গুচ্ছের ওপর রঙিন সুতা পেঁচিয়ে শিকা'র লহর তৈরি করে লহরগুলোকে নানা কায়দায় পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করেও শিকা বানানো হয়। কখনো কখনো পাট বা শন দিয়ে তৈরি শিকার রজ্জুগুলিতে মনোমুগ্ধকর রঙের প্রলেপও দেওয়া হয়। আজ আমরা গৃহে ব্যবহারগত যে শিকা শিল্পের সঙ্গে পরিচিত অর্থাৎ নকশী শিকা তৈরিতে পাট এর সহযোগী উপকরণ হিসেবে থাকে পুরাতন শাড়ির পাড় থেকে তোলা বিভিন্ন রঙের সুতা, বাঁশের ফলি-কঞ্চি, সুতলী, কড়ি, পোড়ামাটির গুটি, আস্ত সুপারী, কাচের মার্বেল, বড়ই বীচি, খেজুর বীচি, হাঁস-কবুতর ও ময়ূরের পালক, রঙিন কাগজের টুকরো, ন্যাকড়া, শন, ঝিনুক, কড়ি, সরিষা, শঙ্খ, হাতের চুরি, বেত-এসব দ্রব্যাদিই সাধারণত শিকা শিল্পের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। (সাইদুর:১৯৯৯:৮)

এ শিল্পের আসল বুনিয়াদ তাই তার বুননে। সেই সঙ্গে বিবিধ ও বিচিত্র পদ্ধতির অবলম্বনে এ সমস্ত শিকা তৈরি হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এই শিল্পকর্মগুলো শুধুমাত্র দৈনন্দিন ঘর-গৃহাস্থলির কাজে একান্ত প্রয়োজনের তাগিদেই তৈরী হলেও মনোমুগ্ধকরনেও সহায়তা করছে। নকশি শিকা এভাবেই কখন যেনো গৃহসজ্জার সামগ্রীও হয়ে ওঠেছে। ব্যবহার ও নকশাভেদে কয়েক রকমের নকশি শিকার প্রচলন রয়েছে।

বাংলাদেশের প্রচলিত কয়েক ধরনের শিকার নাম: হাত ধরাধরি শিকা, ডালিম শিকা, ঝালর শিকা, লহরি শিকা, ফুলটঙ্গী ইত্যাদি। উল্লেখ করা প্রয়োজন, অঞ্চলভেদে একেকটি শিকা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত।

পাতিল রাখার শিকা, কলসী রাখার শিকা, কাঁথা/বালিশ রাখার শিকা, বই/পত্র রাখার শিকা, আয়না- কাঁকই রাখার শিকা, নক্শী হাড়ির শিকা, বৈয়ম রাখার শিকা, বাসনপত্র রাখার শিকা, শিশি/বেতাল রাখার শিকা, মাটির ঝাড় রাখার শিকা, পাখা রাখার শিকা, আলনা শিকা, খিলাই রাখার শিকা, ঘরের শোভা বর্ধনের শিকা, ধামা রাখার শিকা, দোলনা শিকা, বিছানাপত্র রাখার শিকা, বাঁক শিকা, ঝালড় শিকা, দোয়লী শিকা, হিংলা শিকা ব্যবহারগত শ্রেণীর এ নামগুলোই উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের সর্বত্রই কমবেশি শিকার প্রচলন থাকলেও নকশি শিকার জন্য ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ জেলার বিশেষ খ্যাতি আছে। এছাড়া হবিগঞ্জ, নরসিংদী, গোপালগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রংপুর, রাজশাহী জেলাতেও নকশি শিকার বহুল ব্যবহার দেখা যায়। বাংলার নকশি শিকা মূলত নারীদের অবদান। বর্তমানে গ্রাম ও শহরের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের কারণে শিকার ব্যবহার কমে গেলেও তা একেবাওে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। (আকন্দ: ২০১৩: ৮৩)

এই শিল্পগুলোর বিভিন্নভাবে নামকরণ করা হয়ে থাকে। প্রথমত ব্যবহার ভেদে এবং দ্বিতীয় বুননের দিক থেকে নামকরণ করা হয়। যেমন-

১. কাপড় রাখার শিকা
২. হাড়ি রাখার শিকা
৩. কাঁথা বালিশ রাখার শিকা
৪. আয়না চিরুনি রাখার শিকা

বুননভেদে নামকরণ

১. গিরা দেওয়া শিকা
২. জালি বোনা শিকা
(খান : হবিগঞ্জ- ২০১৪: ১৬৪)।

বিভিন্ন জেলায় শিকার বিভিন্ন নামকরণ লক্ষ্য করা যায়। যেমন-
ময়মনসিংহ অঞ্চল হতে সংগৃহীত বড় পাত্র ও বাসনপত্র রাখার শিকা- চাদরের বেড়, একত্রে গ্লাস/বাসন রাখার শিকা- উল্টা বেড়ী, বেতের ধান/চাল রাখার পাত্র- সরফুশ, বাসন/পত্র রাখার- ফুলমালা, শিশি/বোতল রাখার শিকা-বেলকী বাইন, ঘটি/বাটি রাখার-মাছের কাঁটা, কলসী/পাতিল রাখার- চমক পাটি, হাঁড়ি/পাতিল রাখার- চিলের চোখ, বৈয়ম/বাটি- জয়ফুল মালা, বাসন/পত্র রাখার- ঝালর বেড়, বড়পাত্র ও পাতিল রাখার - রসুন দানা শিকা ইত্যাদি। এছাড়াও এই একই অঞ্চলের চাইর গুচা, গরুর দানহা, ডালিম ফুল, লারের শিকা, জাওলা বেড়ি শিকা, বুবি শিকা, আনারসি, কটির ঘর, বড়ই ফুল, ফুলঝুরি, আওলা আংটি, আংটি বেড় ইত্যাদি নামের শিকা তৈরি করা হয়।

কিশোরগঞ্জ জেলা হতে সংগৃহীত শিকাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মাকড়ের ঘর, ছিহল বেড়, ঝিংগা বেড়ি, বলদের চোখ, হরু ফুল, বেঁট ফুল, কাঁকই বেড়, কাউয়্যার ঠ্যাং, মারুয়া গিট্যাঁ, কাঞ্চন বেড়ি, জোড় বেড়ি, মাকড়শী, পাংখা বেড়ি, ফুর

ঝাড়, মাদারফুলি, বালুক ঝাঁপা, সাতেশ্বরী, কানফুলি, কাউয়্যা কাঠি, আট ঘড়ি ইত্যাদি।

নরসিংদী জেলায় মিলেছে কাঁঠালী, গান্‌জা, জোথ্‌, ফুলটুংগী, খিলাইটুংগী, খিলাইদানী, ময়ূর পেখম। গোলক বেড়, কড়ি দানা, আম ঝুপি ইত্যাদি নামের শিকা।

ঢাকায় পাংখা দানী, ফুল মাচাং, জালি বাইন, বান্দর লড়ি, কাঞ্চন সুন্দরী, উড়ি ফুল, চিলা বাঁছা, বেতা বাইন, ঝুপরী টানা, হাঁপ বেড়ি, কেঞ্চিবেড়ি, উল্টা বেড়ি, গোলক বেড়, কড়ি দানা, আম ঝুপি ইত্যাদি নামের শিকা পাওয়া যায়।

টাঙ্গাইল জেলায়- তলি ছাড়া, বাজু শিকা, বলাকতলী, জিলাপির প্যাঁচ, ঝাঁপড়ি, আলহা দানহা, চিলা বাঁহা ইত্যাদি নামের শিকা পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় বড় বাটি/ঘটি রাখার- পাতা শিকা, বৈয়ম রাখার-ইচাঁর ঠ্যাং শিকা, বড় থেকে ছোট পাত্র রাখার- লাটিম শিকা; এছাড়া লাউয়ের আলী, ঘাষড়ি শিকা, বালক বেড়ি, কদম ফুলি ইত্যাদি নামের শিকা পাওয়া গেছে।

গোপালগঞ্জ জেলায় পঞ্চমুখী, ত্রিমুখী, সপ্তমুখী, চান্দা, বুচকা, বাঁওটি, কাঠি শিকা, বেলফুলি, ধান্দাবেড়ী, নাহা দড়ি, মুখ বেড়, ফুল চাং, এক চোখা গুলি, তিন চোখা গুলি, সাত চোখা গুলি, নয় চোখা গুলি, পল বেড়, ডাউক ফান্দ, ডালিম শিকা, কইতর চতি, বাঁউক ঝোলা, লক্ষ্মী ঝাড়, মাগুন্দা বেড় ইত্যাদি নামের শিকা পাওয়া যায়। (সাইদুর:১৯৯৯: ১১, ১৬)

কৃষিজীবি গ্রাম বাংলার মানুষ তাদের নিজস্ব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিজেরাই তৈরি করে নেয়। কৃষিকাজের কর্মব্যস্ততার চাপ যখন কম থাকে তখন মূলত বর্ষাকালে এ শিল্প তৈরি হয়। শিকা এমনই একটি মাধ্যম যা একান্তই নারী সমাজের সৃষ্টি। বাংলার মা- বোনেরা উষ্ণ অভিব্যক্তি ও স্নেহ ভালবাসার এক বিরল নজীর। শিকা তৈরির সময় বর্ষাকাল ও তৎপরবর্তী সময়। এ সময়টা কৃষক সমাজে কাজ না থাকায় নারী সমাজ তাদের অবসর সময়ে একা অথবা পাড়াপড়শীর সাথে মিলেমিশে এ শিল্প তৈরি করে থাকে। ছোট শিকা একজনই তৈরি করে তবে বড় শিকার বেলায় একের অধিকও একসঙ্গে কাজ করে। সঙ্গে চলে নানা ধরনের গালগল্প আলাপচারিতা। তাতে জড়িয়ে থাকে তাদের জীবনের নান অনুভূতিপূর্ণ সুখ-দুঃখ। (কাইয়ুম:২০১২: ১২৬)

কিশোরগঞ্জের সর্বত্র শিকা ব্যবহৃত হয়। কিশোরগঞ্জ এলাকার বিভিন্ন ধরনের নক্‌শি শিকা প্রচলিত। তা মাটির হাঁড়ি, কলসি, বোতল, ঠুলি ইত্যাদির জন্য অদ্যাবধি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিকার ব্যবহারিক ও কারুকার্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন নামে অবহিত করা হয়। যেমন-কবুতর খুপী, তারাফুল, ইচার ঠ্যাং, টাকাফুল, চড়াফুল, উড়িফুল, বেঁটফুল, হিজলপাতা, কাজলপাতা ইত্যাদি। পাট ও শিকা তৈরির উপকরণ।

শিকাগুলো সাধারণত মুঠাশিকা, নেংটা শিকা, চাক শিকা ও কড়ি শিকা নামে খ্যাত ও পরিচিত। (খান : কিশোরগঞ্জ-২০১৪: ২৬৪)।

প্রথাগত শিকা ছাড়াও একধরনের শিকা কিশোরগঞ্জে দেখা যায় এর নাম ফুলঝার বা ফুলটুঙ্গি। ফুলঝার বা ফুলটুঙ্গি তৈরি করতে পাটের সঙ্গে রঙিন সুতো, এবং বাঁশের চটা বা বাতার প্রয়োজন হয়। আকারে ১.৫´ x ১.৫´ থেকে ২´ x ২´ ফুট মর্যন্ত হয়। চৌকোণা ত্রিকোণা এবং গোলাকৃতির আকার বিশেষ। কোন কোন ফুলঝাড় দুই থেক তিন থাকের পর্যন্ত হয়। ফুলঝাড় শক্ত লাটি বা বাঁশের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়। প্রয়োজনীয় জিনিস ছোট ছোট বাক্স পেটারা এবং পুস্তকাদি এতে সংরক্ষিত হয়। কিশোরগঞ্জে হ্যাঙ্গার জাতীয় এক প্রকার শিকার প্রচলন আছে। লম্বায় ৪/৫ হাত পর্যন্ত দেখায় যায়। মাঝখানে শিকার বুনুনি জালের মতো এবং দুই প্রান্তের শেষ জায়গায় একত্রিত হয়ে প্রান্তের শীর্ষভাগে লম্বা দড়ির মতো থাকে যাতে দুই দিকে বাঁধার সুবিধা হয়। প্রান্ত দুটির মাথায় রঙিন সূতার কারুকাজ করা হয়। এই ঝুলন্ত হ্যাঙ্গারে লেপ, কাঁথা ও বালিশ এবং প্রয়োজনীয় কাপড় চোপড় রাখা হয়।

নকশি শিকা শুধু সৌন্দর্যই প্রদর্শন করে না, পরিবারের রুচিবোধ ও লোককর্মের প্রশংসা করে, বিশেষত মহিলাদের। গ্রামের অভিজাত পরিবারের ঘরে সুতা ও পাটের তৈরি শিকা হবিগঞ্জে ব্যবহার হতে দেখা যায়। ঘরের দেয়াল বা বেড়া (দাপনা) ঘেঁষে একটি বাঁশের লাঠির দুপ্রান্তে শিকা বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়। শিখায় রাখা হয় নানা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কৌটা, হাড়ি পাতিল ইত্যাদি। শিকাগুলো বিভিন্ন ধরনের। পাটের গোছা পাঁকিয়ে পাঁকিয়ে রঙিন সুতায় প্যাঁচানো চারটি লড়ি জড়ানোর উপর ভাগ এক করে গিট দিয়ে বাঁধা, নিচে চাক বা বেড়ি। চাক বা বেড়িকে পাট ও রঙিন সুতা দিয়ে জড়ানো। বাঁশের চাকটিকে সহজে চেনা যায় না। এক বাড়িতে দেখা গেল এরূপ ছয়টি নকশি শিকা বাঁশের লাঠিতে ঝুলানো আছে। অন্য একটি বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, দুটি নকশি শিকা ঘরের দেয়ালে দুপাশে পেরেক দিয়ে আটকানো। শিকা দুটিতে ফুলের (কাগজের ফুল) টব বসানো রয়েছে। খুবই সুন্দর কারুকার্যে শিকা দুটি তৈরি। নকশা প্রায় একই, কেবল রঙের বদল করা হয়েছে। শিকাগুলো পাট ও সুতারই তৈরি, তবে এই পাটের গোছাকে পাক দিয়ে খুবই সরু করা হয়েছে। এতে হাতের ভাঙা কাচের চুরির টুকরো ভেতর দিয়ে পাঠ ভরে স্থানে স্থানে রঙিন সুতা প্যাঁচ দিয়ে আবার ওপরের অংশে মেয়েদের মতো চুলের বেণি বেঁধে তৈরি করা হয়েছে। (খান : হবিগঞ্জ-২০১৪: ১৬৬) ।

এইসব নকশি শিকায় পল্লী নারীর সৌন্দর্যপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও ঘর গুছিয়ে রাখার বা সুসজ্জিত করার বোধ সম্পন্ন মানুষ । তাঁরা প্রকৃতির নানা ফুল ও ফল হাতের কৌশলে পাটের আঁশের সাহায্যে তৈরি করে। এরপর সহজলভ্য বিচিত্র রঙ ব্যবহার করে নানাজাতীয় ফুল ও ফল প্রস্তুত করেন। অনেক সময় কাপড় রাখার জন্য বাঁশের ঝাইল গ্রামের গৃহস্থ ঘরে পরিলক্ষিত

হয়। এই বাঁশের ঝাইল আর কিছু নয় বরং বাঁশ ও পাটের আঁশ দিয়ে তৈরি নকশি শিকা। এ শিকা গোলাকার কিংবা ত্রিভুজাকার অথবা বর্গাকার হয়ে থাকে। প্রথমে বাঁশের বাতা শক্ত করে বেঁধে চাক তৈরি করা হয়। ত্রিভুজাকার বা চতুর্ভুজাকার চাক কাপড় দিয়ে প্যাঁচানো হয়। তারপর চাকটি ঝুলাবার জন্য কৌশলে নকশি শিকা সেট করা হয়। এই শিকা ঝুল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আবার চাকের মধ্যে আলাদা আলাদা শিকাও বাঁধা হয়। আবার চাকের মধ্যে জাল সেট করা হয় কাপড় রাখার জন্য। ঐ জালও আড়াআড়িভাবে নকশি হয়ে থাকে।

রংপুরের গৃহ বধু সামছুন নাহার বলেন, বেনীর সাহায্যে ফুল ও বিভিন্ন ধরনের ছবি তৈরি করে শিকা তৈরি করা হয়। ফুলের নাম অনুসারে শিকার নামকরণ করা হয়। যেমন- পদ্মফুল, তারা ফুল, পুতি ফুল ইত্যাদি। ফাসের কৌশলে চাকতি ও পুথির মধ্যে দানা অথবা তারা মতো বুটি দিয়ে ফুল জাতীয় শিকা তৈরি করা হয়। শিকার নিচের দিকে বেড়ি অথবা মুঠা থাকে। তার নাম অনুযায়ীও শিকার নামকরণ করা হয়।

তথ্যদাতা : মোছাঃ সামছুন নাহার, স্বামী-মৃত সোলেমান মিয়া, বয়স-৭৫, পেশা-গৃহিনী, কিশামত শেরপুর, বেতগাড়ী, গংগাচড়া, রংপুর। (খান : রংপুর-২০১৪: ১২২)।

গ্রামের মেয়েদের কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। তারপরও শিকার নকশা তৈরিতে নানাবিধ কৌশল প্রয়োগ অবাক করার মতো। শিকা গৃহস্থালি কাজের জন্য নির্মিত হলেও তার মধ্যে শিল্পীর কারুচাতুর্য এবং সৌন্দর্যচেতনারও প্রকাশ ঘটে। পুঁতি, কড়ি, মাটির গোলাকার ঢেলা ইত্যাদির সাহায্যে শিকায় নকশি করা হয়। এর গ্রন্থিবৈচিত্র্য ও অলঙ্করণ-প্রক্রিয়া একটি অভিনব ব্যাপার। এতে বিভিন্ন রকম গ্রন্থি ব্যবহার করা হয়, যেমন মাউরা গিরা, রসুন গিরা, পাগড়ি গিরা, দামান গিরা, টাহা(টাকা) গিরা, বড়শি গিরা, ঝুঁটি গিরা, সুপারি গিরা ইত্যাদি। এর সঙ্গে যেসব অলঙ্করণ যুক্ত হয় সেগুলি হচ্ছে সিকি, টাকা, হাতির কান, ডালিম ইত্যাদি। কোনো কোনো শিকায় অষ্টদলপদ্ম ও কদমফুলের অলঙ্করণও দৃষ্ট হয়। বাংলাদেশের সর্বত্রই নানা আকারের ও নানা প্রকারের শিকা দেখা যায়। শিকার নকশা ফাঁস তোলা ও বিনুনি গাঁথার কৌশলের ওপর নির্ভর করে। তাঁরা ফুল, মোরগ ফুল, পুঁতি ফুল ইত্যাদি নকশার শিকা তৈরি হয়। বাংলা একাডেমীর সংগৃহীত একটা শিকায় পদ্ম ফুলের নকশা আছে। (চৌধুরী, ২০১৫, ১৩:৪৩)

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও লোকশিল্পের গবেষক তোফায়েল আহমেদ এর ব্যক্তিগত সংগ্রহের রয়েছে হাত ধরাধরি শিকা, ডালিম শিকা, তোয়ালিয়া শিকা, ঝালর শিকা, ফুলটুঙ্গী শিকা, লহরী শিকা। কিছু নকশি শিকার বর্ণনা তুলে ধরা হলো।

বিভিন্ন আকারের হাঁড়ি, পাতিল, বোতল প্রভৃতি রাখার জন্য পাট দিয়ে তৈরি পরস্পর সংলগ্ন শিকা হাত ধরাধরি শিকা। এটিকে পাবনার বেড়া অঞ্চলে ‘হাত (সাত)

বোতরের শিকা' বলে। সাত সংখ্যার মাহাত্ম তাৎপর্যপূর্ণ। প্রচলিত সংস্কার মতে সাত হচ্ছে সৌভাগ্যসূচক সংখ্যা। তবে 'হাত' বা 'সাত' বোতরের শিকায় সবসময় পৃথক সাতটি শিকা না-ও থাকতে পারে। এর সংখ্যায় হেরফের ঘটতে পারে। সাধারণত তিন ধরনের বুনন পদ্ধতিতে হাত ধরাধরি শিকা তৈরি করা হয়,

১. পাট পাক দিয়ে

২. আলগা পাট সুতা দিয়ে বেঁধে লহর তৈরি করে এবং

৩. চুরের বেণীর মতো পাটের বেণী করে।

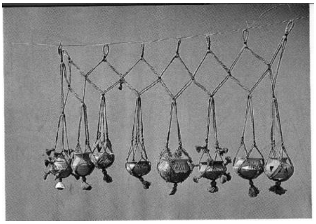

চিত্রে সুনিপুণভাবে পাট দিয়ে তৈরি দৃষ্টিনন্দন শিকাটি ৭১ সে.মি লম্বা। এই হাত ধরাধরি শিকাটিতে আটটি শিকা রয়েছে। এগুলো দেখতে জারের মতো। এতে আটটি শিকা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হলেও প্রত্যেকটি আলাদা। আলাদাভাবে প্রতিটি শিকায় ছোট আকারের হাঁড়ি, পাতিল, বোতল প্রভৃতি রাখাহয়। লম্বা চিকন বাঁশ দিয়ে এই শিকা ঘওে ঝুলানো থাকে। বর্তমানে হাত ধরাধরি শিকার ব্যবহার নেই বললেই চলে। চিত্রের হাত ধরাধরি শিকাটি নাজিরপুরের কমলাকান্দি থেকে ১৯৮৫ সালে সংগৃহীত।

ডালিম শিকাটির দৈর্ঘ্য ১৬৮ সে.মি.। এত পাটের তৈরি একুশটি ডালিম ঝুলানো। ঝুলন্ত ডালিমযুক্ত শিকার উপরে ছোট পাত্র রাখার জায়গা যেমন আছে তেমনি নিচের বড় পাত্রে মুড়ি, চিড়া, খই ইত্যাদি রাখার ব্যবস্থাও রয়েছে। ডালিমের আকারে শিকাটি শিল্পমন্ডিত, এজন্য এর নাম ডালিম শিকা। এটি ১৯৯২ সালে ঢাকার একটি কারুপণ্যেরদোকান থেকে সংগৃহীত।

ছোট আকারের তোয়ালে রাখার জন্য বাঁশের শলা সহযোগে পাট নির্মিত তোয়ালিয়া শিকা। একসময় ছোট তোয়ালে কিংবা এ জাতীয় জিনিস রাখার কাজে এরূপ শিকার বহুল ব্যবহার দেখা যেতো। বর্তমানে এর ব্যবহার এর ব্যবহার ও প্রচলন উঠে গেছে। চিত্রের শিকাটি ৬৭ সে.মি. লম্বা। এই শিকায় উপর থেকে পাটের বেণী

পাকানো দু'টি রশির মাঝখানে বাঁশের তিনটি শলা বা দন্ড আছে। শিকার শীর্ষের দন্ডে রয়েছে পাটের তৈরি লাল, সবুজ, ও কারো রঙের জারের বুনন এবং এর নিচে আছে ছয় পাতার তিনটি বিনুনিযুক্ত ফুল। শিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় দন্ড দু'টি তোয়ালে রাখার জন্য। ত্রি-কোণাকৃতি শিকাটি ১৯৬৮ সালে রাজশাহী থেকে সংগৃহীত।

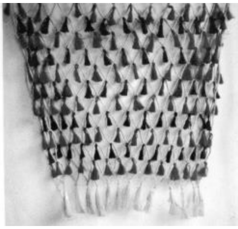

ঝালর শিকাটি তৈরির জন্য প্রথমে সাদা পাট দিয়ে বেণী বানিয়ে সেই বেণী দিয়ে জাল বোনা হয়। পরে জালের খোপে একটার পর একটা রঙিন ছোট ঝালর ঝুলানো হয়। শিকাটি বাঁশে ঝুলিয়ে রাখার জন্য শিকার উপর আংটাও করা হয়।

কোরানশরীফ, বইপত্র, টুপি প্রভৃতি রাখার জন্য বাঁশ ও পাট দ্বারা তৈরি রঙ্গিন সুতা ও কাপড়ে অলঙ্কৃত ফুলটুঙ্গী শিকা। প্রথমে বাঁশের চারকোণা বা গোল চাকা তৈরি করে তাতে শিকার লহর বা জালি বুনে ফুলটুঙ্গীর 'চাঙ' বানানো হয়। এরপর চাকাটি লালসালু কাপড়দিয়ে মুড়ে নিয়ে চার লহরের চারটি দড়ি চাকার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এই চারটি দড়ির অন্যপ্রান্ত একসঙ্গে যুক্ত করে ফুলটুঙ্গীটি ঝুলানো থাকে। বর্তমানে গ্রাম-বাংলায় ফুলটুঙ্গীর ব্যবহার খুবই কম।

কয়েকটি লহরে তৈরী লহরী শিকা। এই শিকায় উপর থেকে নিচের অংশ পর্যন্ত ক্রমন্বয়ে ছোট ও বড় পাত্র রাখা যায়। এছাড়া নিচে বড় পাত্রের চারিপাশে কয়েক লহরে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট পাত্র রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। এটি লম্বায় ১৬৫ সে.মি। পাট জড়িয়ে রসুনের আকারে ঝালর তৈরি করে শিকাটি শিল্পমন্ডিত করা হয়েছে।

গ্রামীণ মেলায় লোক ও কারুশিল্পের নানান সামগ্রী বিক্রির জন্য উঠত। কিন্তু নকশি শিকা কখনই মেলার পণ্য হয়ে তৈরীই হতো না, বিক্রীর জন্যত নয়ই। এক ধরনের পর্দানশীল শিল্পই বলা চলে নকশী শিকাকে। তবে এই নকশি শিকার ব্যবহার আগে ছিল শুধুমাত্র বিভিন্ন গৃহাস্থলির কাজে। কিন্তু আধুনিক শহরে এসে বর্তমান যুগে শিকা ধারণাটিকে নতুন মাত্রা দিচ্ছে। আধুনিক জীবন যাপনে নকশি শিকার ব্যবহার যে নিতান্তই খাদ্যদ্রব্য বা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংরক্ষনের জন্য-তা নয়। (আহমদেঃ ২০০৪: ১১১-১১৬)

এখন নকশি শিকা ব্যবহৃত হচ্ছে মানি প্ল্যান্ট ও অন্যান্য টবে লাগানো গাছের ধারক হিসেবে। সেই সঙ্গে ঝুল বারান্দার শোভা দ্বিগুন বর্ধিত করার জন্যও। ইট কাঠের চার দেয়ালকে বৈচিত্র্যময় করে তুলতে পারে এই সব নকশি শিকা। আধুনিকতার ছোয়া এখন নকশি শিকার সারল্যকে গ্রাস করেছে। বর্তমানকালে নকশি শিকা শুধুমাত্র অন্ত:পুরবাসিনীর তৈরী শিল্পকর্ম নয়। যন্ত্র নির্ভর নগর জীবনের রূঢ় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শিকা এখন উৎপাদিত হচ্ছে বিক্রয়ের পণ্য হিসেবে।

নকশি শিকাগুলোর এ পর্যন্ত যতগুলোর বর্ণনা পেয়েছি বা দেখেছি তাতে এর গঠন শৈলী, তৈরী পদ্ধতি ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে যা অনুধাবন করেছি তা হলো এটা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে বাঙালীর ছিল নকশি শিকার অফুরন্ত ভান্ডার। যদিও আজ তা ধরা ছোয়ার বাইরে। সঠিক সংরক্ষণ, সংগ্রহ, গবেষণা ইত্যাদির অভাব এবং একই সাথে পাল্লা দিয়ে আধুনিক যুগের দ্রুত গতিশীল জীবনাচারণ নকশি শিকার ব্যবহারিক দিককে ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে ধাবিত করেছে। শিকার উপযোগিতা ও উদ্দেশ্যকে উৎরিয়ে এতে বিচিত্র বুনন, শৈলী, গিট, প্যাঁচ ইত্যাদির ঐক্যতানে প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন উপাদান এর সংযোজনে এবং বিভিন্ন মোটিফ এর প্রতিচ্ছবি নির্মাণের এই প্রচেষ্টা তাদের পরিপূর্ণ ও উন্নত শৈল্পিক মনস্তাত্বিকতারই পরিচয় দেয়। শিকার গায়ে বিবিধ বুনন, ফর্ম, বিভিন্ন দিক, সরল ও বক্র রেখা ও আকারের সংযোজন, সংমিশ্রন একত্রে যে যোজনার সৃষ্টি করে তা শিল্প মাধ্যম হিসেবে নকশি শিকাকে বিরল দৃষ্টান্তের অধিকারী করে তোলে।

শিকা তৈরীর কারিগরেরা শুধুই নারী। বাঙালীর ঘরে ঘরে বংশ পরস্পরায় তারা এর বুনন কৌশল রপ্ত করে। সেই সঙ্গে নিজস্ব পদ্ধতির প্রয়োগ করে। একেকটি শিকার নকশার জ্যামিতিক গঠন, ফুল, লতাপাতা- এটা ভাবতে বাধ্য করে যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাহীন এ সকল লোকজ নারীদের বিচক্ষণতাই মূলত এ শিল্পের মূল চালিকা শক্তি। সামান্য জিনিস কি করে অসামন্য করা যায় তা প্রতিটি শিকায় লক্ষ্যণীয়। ঘরে থাকা হাতের কাছের কিছু জিনিসপত্রকে কাজে লাগিয়ে ব্যবহার্য বস্তুটিকে শৈল্পিক রূপদানের এ প্রয়াস সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। বর্তমান কালের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে এ নকশি শিকা তার যৌলুস হারিয়েছে অনেক আগেই। পূর্বের ন্যায় ঘরে ঘরে নকশি শিকার

ব্যবহার নেই বললেই চলে। এমনকি এর সামান্য নমুনার ছিটা ফোটাও আজকাল খুব একটা দেখা যায় না। বিভিন্ন মিউজিয়াম ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে যা কিছু আছে অল্প বিস্তর তাই দেখে তুষ্ট হতে হবে; যদিও সংখ্যায় নগন্য। তারপরও যা কিছুই বিদ্যমান তা দেখে এটা বলতেই হয় বাঙালী নারীর একান্ত নিজস্ব এ শিল্প যুগ যুগ ধরে আবহমান বাঙালী নারীর নান্দনিক শিল্প বোধ এর পরিচয় তুলে ধরে বিশ্ববাসীর কাছে এবং সেই সঙ্গে বাঙালী হিসেবে আমারও গর্ববোধ হয়।

হারিয়ে যাওয়া এ শিল্পকে পুনরুদ্ধার করতে অনেক সংস্থা যেমন কারিতাস, আরং এগুলো নিয়ে কাজ করেছে। কিন্তু ঐতিহ্যবাহি যে কোন জিনিস তার স্বাকীয়তাকে নিয়ে সামনে এগুলে সেটার মর্যদা অক্ষুন্ন থাকে। নতুবা এর উদ্দেশ্য বিনষ্ট হয়। নকশি শিকা যা কখনই বাজারে বিক্রি হতো না তা এখন বিপনি বিতানে বিক্রয় হয়। গৃহসজ্জার উপকরণ হিসেবে অনেক পরিমার্জিত ও অনেক পরিবর্তিত রূপে। এ পুনরুদ্ধার কি সম্ভব কিনা জানা নেই তবে হয়তো ঘরে ঘরে নারীরাই পারবে এর পূর্ববর্তী শিল্পমানকে উদ্ধার করতে যদি ঘরে ধরে নারীরা সকলে মিলে উদ্যোগ নেই তাদের নিজস্ব শিল্পকে বাঁচাতে। তবেই সম্ভব; হয়তো।

বর্তমানকালে মানুষের রুচি, বৈচিত্র্যের পিয়াসার কথা ভেবে তৈরী করে নকশি শিকা। ঐতিহ্যের সাথে আধুনিকতার মেলবন্ধনে শিল্প নতুন মাত্রা পেয়েছে। কিন্তু এই আবেগমাখা , ভালোবাসাময় নকশি শিকা আজ আর নেই বললেই চলে। এগুলো আজকাল গ্রামে গঞ্জের সামান্যই তৈরি হয়। বৈচিত্র্যময় নকশি শিকা এখন আকর্ষনীয় বাজারের কারুপণ্য হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু হালের জীবন যাপনের গতিশীলতায় আমাদের একটু লক্ষ্য রাখা উচিত যে, বাহুল্যতাবর্জিত এ শিল্পটি যেন ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে গ্রামীণ সমাজের প্রকৃতি ও পরিবেশকে আগলে রেখে আধুনিকতার দিকে ধাবিত হয়। তবেই বাংলাদেশের কারুশিল্পের ভান্ডার হবে সমৃদ্ধ।

ঢাকায় একটি বিক্রয় কেন্দ্রে বিভিন্ন ধরনের শিকা

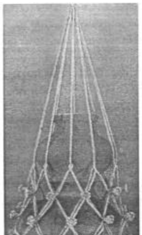

কারুকার্যময় শিকা ফুলের নকশা তোলা শিকা

শিকা বুনছে একজন নারী

নকশি শিকা, ঢাকা

নকশি শিকা, রাজশাহী

নকশি শিকা, ময়মনসিংহ

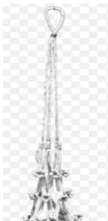

ফুলের নকশা করা সমসাময়িক কালের শিকা

হাত ধরাধরি শিকা, খুলনা

আধুনিক যুগের নকশি শিকার নানাবিধ ব্যবহার

তথ্যসূত্রঃ

এম.এ. কাইয়ুম, কিশোরগঞ্জের লোকজ ঐতিহ্য ও চারুকলা, চন্দ্রাবতী প্রকাশনী, এপ্রিল ২০১৩ খ্রিঃ।

এম.এ.কাইয়ুম, আদি শিল্প চিরন্তন সংস্কৃতি, মুক্তচিন্তা প্রকাশনা; মার্চ, ২০১২ খ্রি.।

তোফায়েল আহমেদের বাংলার ঘর থেকে নির্বাচিত সংগ্রহ।

সম্পাদক : সৈয়দ মাহবুব আলম, সাইদুর, মোহাম্মদঃ বাংলাদেশের নকশী শিকা, লোকশিল্প প্রবন্ধ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন; জুন, ১৯৯৯।

শাওন আকন্দ, বাংলাদেশের লোকশিল্পের রূপরেখা জার্নিম্যান- জলরঙ যৌথ প্রকাশনা, ফেব্রুয়ারী ২০১৩।

সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, খন্ড ৬, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, জুন, ২০১১।

প্রধান সম্পাদক : শামসুজ্জামান খান, বাংলাদেশ লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, কিশোরগঞ্জ, বাংলা একাডেমী, জুন ২০১৪।

প্রধান সম্পাদক : শামসুজ্জামান খান, বাংলাদেশ লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, হবিগঞ্জ, বাংলা একাডেমী, জুন ২০১৪।

প্রধান সম্পাদক : শামসুজ্জামান খান, বাংলাদেশ লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, রংপুর, বাংলা একাডেমী, জুন ২০১৪।

প্রধান সম্পাদক : শামসুজ্জামান খান, বাংলাদেশ লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, হবিগঞ্জ, বাংলা একাডেমী, জুন ২০১৪।

মোমেন চৌধুরী, bn.banglapedi.org/index.php/নকশি শিকা, সময় : ১৩:৪৩, ২৮ জানুয়ারি, ২০১৫।

Ferdous, File : শিকা.jpg- WIKIMEDIA COMMONS, 13 September 2010, 15:10:19